শিশির ভট্টাচার্য্য

সিংহাবলোকনে ব্যাকরণ : অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহের ব্যাকরণ-ভাবনা

অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৪৩-২০১২) ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে জন্মগ্রহণ করেন। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করার পর তিনি ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি. করার পর ১৯৭২ সালে কানাডার মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করে আমৃত্যু সেখানেই কর্মরত ছিলেন। অধ্যাপক সিংহের গ্রন্থসংখ্যা পনেরোটির মতো, আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধসংখ্যা শতাধিক। রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে অধ্যাপক সিংহের নিজস্ব তত্ত্ব রয়েছে। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা। ভারতের মহীশুরের Central Institute of Indian Languages (CIIL) কর্তৃক আয়োজিত দুটি শীতকালীন কর্মশালায় রাজেন্দ্র সিংহ রূপতত্ত্ব (২০০২) ও ধ্বনিতত্ত্ব (২০০৫) বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (Singh, unpublished manuscript)। সেই বক্তৃতা দুটি, তাঁর ক্লাসে উপস্থিত থেকে নেয়া নোট, তাঁর রচনা এবং সর্বোপরি ২০০৪ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে বহু দীর্ঘ আলোচনার উপর ভিত্তি করে ব্যাকরণ বিষয়ে রাজেন্দ্র সিংহের চিন্তাভাবনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। রাজেন্দ্র সিংহের কথা উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে দেয়া হয়েছে। [লেখক-অনুবাদকের নিজের কথা ও ব্যাখ্যা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে।]

"ব্যাকরণের কথা উঠলেই ভারতবর্ষে লোকে পাণিনির নাম করে, যদিও পাণিনির নাম যারা করে তাদের মধ্যে অনেকেই অষ্টাধ্যায়ীর একটি পৃষ্ঠাও উল্টে দেখেনি। এ অনেকটা 'সবকিছু বেদে আছে' বলার মতো। যারা এ দাবি করে তাদের অনেকে বেদ চোখেও দেখেনি। জানতে ইচ্ছে হতে পারে, কেন ভারতবর্ষের ভাষাতাত্ত্বিকেরা কথায় কথায় পাণিনির উল্লেখ করেন। তাঁরা ভাবেন, মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড বা চমস্কির মতো বিখ্যাত বিদেশি চিন্তক যেহেতু পাণিনিকে সম্মান দিয়েছেন, সেহেতু পাণিনি নিশ্চয়ই বড় কিছু হবেন! কিন্তু পাণিনি ছাড়াওতো ভারতবর্ষে আরও অনেক বৈয়াকরণ ছিলেন। কাত্যায়ণ ছিলেন, নাগেশ ছিলেন, ছিলেন পতঞ্জলী। ভর্তৃহরি পাণিনিকে চোখ বুজে অনুসরণ করেননি। এদের কারও কথা কেউ বলে না না প্রাচ্যে, না পাশ্চাত্যে। জ্ঞানচর্চা কি নিছক একজন মাত্র ব্যক্তিকে দিয়ে হয়? [একজন একটা থিসিস দেয়, সেই থিসিসের সমালোচনা করে অন্য একজন একটা এ্যান্টিথিসিস দেয়, তারপর আর একজন একটা সিনথিসিস করে। জ্ঞানচর্চার যে কোনো ঐতিহ্য এই থিসিস-এ্যান্টিথিসিস-সিনথিসিসের সমন্বয়ে গঠিত হয়।] অনেক লোক, অনেক যুগ ধরে এই ঐতিহ্য গঠনে অবদান রাখেন, কেউ কম, কেউ বেশি। কারও তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়, কারও তত্ত্বের খবর রাখে দুই একজন। ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে আজ যিনি সংখ্যালঘু, কালই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। এককালে নোয়াম চমস্কির তত্ত্বের একজনও অনুসারী ছিল না। আজ তিনি জনপ্রিয়তম ভাষাতাত্ত্বিক। জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য কোনো একশৈলিক ভাস্কর্য নয়।

সাবেক উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক ধরণের হীনম্মন্যতা থাকে। তারা মনে করে, প্রাক্তন প্রভুর দেশে যা কিছু ফ্যাশনেবল, শুধু তাই সত্য, তাই উল্লেখযোগ্য। এগারো বা বারো বছর বয়সে আমি (রাজেন্দ্র সিংহ) যখন ভারতে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন ইংল্যান্ডে সম্পাদিত সেক্সপিয়রের কোনো কোনো নাটক আমাকে পড়তে হয়েছিল। এগুলোর সম্পাদক ছিলেন বিলাতের কোনো খ্যাত-অখ্যাত উচ্চবিদ্যালয়ের এক্সপার্ট হেডমাস্টার। আমি তখন ভাবতাম, এই সব মাস্টার মহাশয়েরা বুঝি এক একজন বাঘা সাহিত্য-সমালোচক। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ্যবইগুলোকে ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাকর্ম হিসেবে বিবেচনা করার একটা প্রবণতা আছে ভারতবর্ষে। ইংরেজি-ভাষী জগতে যা কিছু লেখা হয় সে সব কিছুকেই এদেশের লোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। পাঠ্যবই আর গবেষণাকর্মের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক সেটা বোঝার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। অনেকেই তাদের প্রবন্ধে পাঠ্যবইয়ের রেফারেন্স দেয়। হ্যাঁ, ব্লুমফিল্ড বা স্যাপিরের মতো ভাষাতাত্ত্বিকের লেখা পাঠ্যবইয়ের রেফারেন্স দেয়া যেতেই পারে, কিন্তু সবাইকেতো তার তাঁদের কাতারে ফেলা যাবে না।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগগুলো ছিল ইংল্যান্ডের এক একটি উপনিবেশ। এখন সেগুলোর বেশিরভাগই মার্কিন উপনিবেশ। উপনিবেশক বা কলোনাইজার হিসেবে ইংল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম. আই.টি-এর চেয়ে উন্নত? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়। তবে যে একটা কথা পরিষ্কার সেটা হচ্ছে এই যে উপনিবেশিত আর উপনিবেশকের সম্পর্ক এতটুকুও বদলায়নি।

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ভাষাবিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক মান আর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় তাদের ভূমিকা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে: চোখ বুজে পাশ্চাত্যের অনুসরণ। উপবিবেশায়নের নেশার রেশ সহজে কাটে না।

ভারতবর্ষের বৈয়াকরণিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার কোনো রোমান্টিক, গদগদ ভাব নেই। কেউ যদি বলে যে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীরা যা যা বলেছেন তার সবই সত্য, তবে সেই ব্যক্তির কথাকে আমি আবর্জনা হিসেবেই ধরে নেবো। তবে এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের বৈয়াকরণিক ঐতিহ্যের পুনর্বিচারে আমি আগ্রহী। হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে 'শব্দ' সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। শব্দ কী? শব্দ কীভাবে গঠিত হয়? একটি শব্দ কীভাবে অন্য একটি শব্দের সাথে যুক্ত হয়? এই সব ভাবনাগুলোর সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অনেক বৈয়াকরণ শব্দের নিত্যতায় বিশ্বাস করতেন। পাণিনি শব্দকে 'ধাতু', 'অঙ্গ', 'প্রাতিপদিক', 'বিভক্তি', 'প্রত্যয়' ইত্যাদি ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিভক্ত করার কথা বলেছেন। কিন্তু এসব ক্যাটাগরির অনস্তিত্বের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন কাত্যায়ন। তিনি বলেছেন, শব্দ যদি সত্য হয়, শব্দের যদি শুরু এবং শেষ থাকে, তবে ধাতু বা অঙ্গের (Stem) কী প্রয়োজন? পতঞ্জলী পাণিনির সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, (ব্যাস)বাক্য থেকে সমাসান্ত শব্দ সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ শব্দের যে কাঠামোগত বা সাংগঠনিক সংস্থিতি (Structural integrity) আছে, বাক্যের তা নেই [অর্থাৎ বাক্যের উপাদানগুলো স্থানপরিবর্তন করতে পারে, শব্দের উপাদানগুলো পারে না]। ভতৃহরি বলেছেন, শব্দের ছেয়ে ছোট যে সব বস্তুর কথা বলা হয়, যেমন বিভক্তি বা প্রত্যয়, সেগুলো বৈয়াকরণদের কল্পনামাত্র। এসব নিয়ে কোনো কথা পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন না। যেহেতু পাশ্চাত্য এসব ব্যাপারে চুপ, ভারতবর্ষও মনে করে, এসব উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয়ই নয়।

১.১. রূপতত্ত্ব

উত্তর আমেরিকার মার্ক আরোনফ (১৯৭৬) তাঁর থিসিসে দাবি করেছেন, রূপতত্ত্ব হচ্ছে 'শব্দের আন্তর্গঠন বর্ণনা' (*the study of the internal structure of words.*)। আমার দাবি, শব্দের কোনো আন্তর্গঠনই নেই। আন্তর্গঠনই যদি না থাকে, তবে শব্দ কীভাবে গঠিত হবে? রূপতাত্ত্বিক বর্ণনাতেই বা কী থাকবে তাহলে? আমি কমবেশি গত দশ বছর ধরে [২০০২ সালে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে] তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু আন্তর্গঠন দেখতে পাইনি পৃথিবীর কোনো ভাষার কোনো শব্দে। রূপতত্ত্বের যে মডেলটির আমি প্রস্তাব করেছি, তাতে কোনো প্রকার আন্তর্গঠনকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়েও শব্দগঠন বর্ণনার কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে।

আমার বা অন্য কারও মডেলের কথা এক পাশে সরিয়ে রাখলেও যে প্রশ্নটি টেবিলে পড়ে থাকে সেটি হচ্ছে: কোনো মানুষের যখন শব্দগঠনের প্রয়োজন হয়, তবে সে কী উপায়ে শব্দ গঠন করে? আলোচনার এ পর্যায়ে 'শব্দকোষে তালিকাভুক্ত শব্দ' (Listed words or actual words) আর 'সম্ভাব্য শব্দের' (Possible words.) মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন রয়েছে। তালিকাভুক্ত শব্দের পরিমাণ হয়তো বিশাল, কিন্তু তালিকাভুক্ত শব্দ সম্ভাব্য শব্দের একটি অতি ক্ষুদ্র সাবসেট (Subset) মাত্র। তালিকাভুক্ত শব্দের ব্যাপারে রূপতত্ত্বের কিছু করার নেই, থাকলেও তা অতি সামান্য। রূপতত্ত্বের মূল কাজ হচ্ছে, প্রয়োজন হলে, সম্ভাব্য শব্দ গঠনের কাজে কোনো ভাষীকে (Speaker) সাহায্য করা। এটি হচ্ছে তত্ত্বনিরপেক্ষ কথা। যে তত্ত্বই আপনি নিয়ে আসুন না কেন, এই একটি প্রশ্নের উত্তরই আপনাকে দিতে হবে, আপনাকে বলতে হবে, ব্যাকরণ কীভাবে দরকারের সময় আপনাকে সম্ভাব্য শব্দগঠনে সাহায্য করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি তত্ত্বনিরপেক্ষ কথা বলি। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্ব – ব্যাকরণের যে উপবিভাগের কথাই আপনি বলেন না কেন, সব ক্ষেত্রে আপনাকে তিনটি প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে করতে হবে:

ক. Question of Domain: কোথায় ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্বের এলাকা শুরু, কোথায় এর শেষ। ব্যাকরণের এসব উপবিভাগের সীমানির্ধারণ করতে হবে আপনাকে।

খ. Question of Representation: এসব উপবিভাগের প্রাথমিক এককগুলো কী কী? কোন কোন বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে এই সব উপবিভাগে?

গ. Question of Mechanism: উপরোক্ত এককগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণটা কী?

যেমন ধরা যাক, রূপতত্ত্বের বেশিরভাগ তত্ত্বে বলা হয়, রূপতত্ত্বের একক হচ্ছে রূপমূল। এই রূপমূলগুলো শব্দগঠন সূত্র মেনে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। রূপতত্ত্বের নিয়মকানুনগুলো বাক্যতত্ত্ব বা ধ্বনিতত্ত্বের চাইতে আলাদা। আলোচনার স্বার্থে আমি ধরে নিচ্ছি, রূপমূল নয়, রূপতত্ত্বের একক হচ্ছে 'শব্দ'। এখন আমি আপনাদের বলবো, শব্দ কীভাবে গঠিত হয়। পাণিনির দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দগঠন একটি একরৈখিক ঘটনা: এক প্রকার ক্ষুদ্রতর উপাদান: ধাতু, অঙ্গ বা প্রাতিপদিকের সাথে অন্য প্রকার ক্ষুদ্রতর উপাদান উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। হ্যাঁ, পৃথিবীর কিছু ভাষায় এভাবে একরৈখিকভাবে বেশির ভাগ শব্দ গঠিত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু আরও বিচিত্র উপায়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। আমি ভর্তৃহরি আর ভিটগেনস্টাইনের চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দাবি করছি, শব্দগঠন একটি বহুমাত্রিক ঘটনা। [কিছু ভাষা আছে, যেমন আরবি বা হিব্রু, যেগুলোতে শব্দে অন্তর্ভুক্ত স্বরপ্রণব (Vowel Phoneme) পরিবর্তন করে শব্দ গঠিত হয় (উদাহরণ: কুতুব/কিতাব/মক্তব)। এমনও অনেক ভাষা আছে (যেমন চীনা বা থাই) যেগুলোতে শব্দের উচ্চারণের ধরণ পরিবর্তন করে শব্দ গঠিত হয়। চীনা ভাষায় তান (Tone)-ভেদে 'মা' শব্দের চারটি অর্থ হতে পারে: 'মা', 'ঘোড়া', 'না' এবং 'মই'। ইংরেজিতে গমকের (Stress) স্থান পরিবর্তন করলে শব্দের অর্থ বদলে যায় (im'port/'import)]। ইংরেজি রূপতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ (ring/rang, foot/feet) আরবির মতো, অন্য একটি ক্ষুদ্র অংশ চীনাভাষার মতো, একটি বড় অংশ সংস্কৃতের মতো (teach/teacher)।

ফরাসি ভাষায় বহুবচন শব্দ গঠনের একটি নিয়ম আছে। কোনো একবচন শব্দ (cheval '(একটি) ঘোড়া') যদি {-আল} দিয়ে শেষ হয় তবে এর বহুবচন রূপটি (chevaux 'অনেকগুলো ঘোড়া') শেষ হতে পারে {-ও} দিয়ে। কোনো বৈয়াকরণ কখনও দাবি করেননি যে 'শ্যভাল' বা 'শোভো' শব্দের অন্তে যে {-আল} বা {-ও} আছে সেগুলো কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি বা রূপমূল। তাহলে কীভাবে 'শ্যভাল' থেকে 'শোভো' শব্দ গঠন করে একজন ফরাসিভাষী? সে খেয়াল করে কীভাবে শেষ হয় 'শ্যভাল' শব্দটি। 'শ্যভাল' শব্দের {-আল} এর জায়গায় {-ও} বসিয়ে সে বহুবচন রূপ গঠন করে (অথবা 'শোভো' শব্দের -ও এর জায়গায় -আল বসিয়ে সে একবচন রূপ গঠন করে)। যে কোনো মানব ভাষার শব্দ এভাবে গঠিত হতে পারে।

একটা গল্প বলি। এক তরুণী তার ছেলেবন্ধুকে নিয়ে এসেছে বাবা-মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। কিছুক্ষণ ছেলেটির সাথে আলাপের পর মা মেয়েকে বললেন: *He has a lot of poise*। শুনে মেয়েটি মাকে জিগ্যেস করলো: *Mam, what is a poy?* 'পয়েজ' শব্দের অন্তে যে /z/ আছে সেটি লক্ষ্য করেছে মেয়েটি এবং সেই /z/-কে বহুবচন-দ্যোতক /z/ বলে ধরে নিয়েছে। এর মানে হচ্ছে, শব্দের শেষ অংশটা খেয়াল করেছে মেয়েটি এবং সেই শেষ অংশটা বাদ দিয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে, যেমনটা মানুষমাত্রেই করে থাকে।' যদি শব্দের সূচনা আর সমাপ্তি দেখে নতুন শব্দ উৎপাদন করা যায়, তবে শব্দের আন্তর্গঠন জানার কী প্রয়োজন আছে? ধাতু-অঙ্গ-বিভক্তি-প্রত্যয় ইত্যাদি ক্যাটাগরিই বা কী কাজে আসে?"

[প্রবন্ধের উপরের অংশটুকু রাজেন্দ্র সিংহের ২০০২ সালের রূপতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা থেকে নেয়া হয়েছে। নিচের অংশটুকু তাঁর বক্তৃতা বা রচনার উপর ভিত্তি করে আমি আমার মতো করে বলেছি বাংলা উদাহরণ সহযোগে একাধিক প্রবন্ধে (বিস্তারিত: ভট্টাচার্য্য ২০১৩)]

১.২. রূপতত্ত্বের অখণ্ড মডেল

রূপতত্ত্বের অখণ্ড মডেল: Whole Word Morphology (WWM)) (Ford, Singh and Martohardjono,1997) দাবি করা হয়েছে যে নিচের একটি মাত্র সূত্র দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার যে কোনো শব্দের রূপতত্ত্ব বর্ণনা করা যায়:

$/X/_{\alpha} \leftrightarrow /X'/_{\beta}$ যেখানে

ক. $/X/_{\alpha}$ এবং $/X'/_{\beta}$ উভয়েই শব্দ;

খ. ' হচ্ছে /X/ এবং /X'/ এর মধ্যেকার যাবতীয় রূপগত পার্থক্যের নির্দেশক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ['] এর মান শূন্য হতে পারে;

গ. α আর β হচ্ছে শব্দের শ্রেণী বা পদ;

ঘ. $\leftrightarrow$ এর মানে হচ্ছে, কোনো রূপকৌশল ডান ও বাম – এই উভয় দিক থেকে ক্রিয়াশীল হতে পারে অর্থাৎ X থাকলে X' থাকবে এবং X' থাকলে X থাকবে;

ঙ. $/X/_{\alpha}$ এবং $/X'/_{\beta}$ এর মধ্যে অর্থগত সম্পর্ক থাকবে।

$/X/_{\alpha} \leftrightarrow /X'/_{\beta}$ এর মানে হচ্ছে, একই রূপগত ও পদগত পার্থক্য প্রদর্শন করে– এমন কমপক্ষে দুই জোড়া অর্থগতভাবে সম্পর্কিত শব্দ যদি থাকে কোনো বাংলাভাষীর শব্দকোষে তবে ১ ও ২ এর মতো **রূপকৌশল** (Morphological Strategy বা Word formation Strategy) সেই বাংলাভাষীর রূপতাত্ত্বিক উপাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. $/XC/_{বি} \leftrightarrow /XCela/_{বিণ}$
সুর $\leftrightarrow$ সুরেলা; রোদ $\leftrightarrow$ রোদেলা

২. $/XCOy/_{বি} \leftrightarrow /XCito/_{বিণ}$
বিনয় $\leftrightarrow$ বিনীত; পরাজয় $\leftrightarrow$ পরাজিত
(O = 'অ' ধ্বনি, o = 'ও' ধ্বনি)

'সুর' ও 'সুরেলা'– এই দুই শব্দের মধ্যে রূপগত পার্থক্য আছে: 'সুরেলা' শব্দটি শেষ হয় 'এলা' প্রণবক্রম দিয়ে। এই প্রণবক্রম 'সুর' শব্দে অনুপস্থিত। 'সুর' বিশেষ্য এবং 'সুরেলা' বিশেষণ। 'সুর' আর 'সুরেলা' – এই দুই শব্দের মধ্যে আর্থ সম্পর্ক রয়েছে। 'সুর/সুরেলা' শব্দজোড়ে যে রূপগত ও পদগত পার্থক্য আছে সেই একই পার্থক্য রয়েছে 'রোদ/রোদেলা' শব্দজোড়ে। কমপক্ষে এই দুই জোড়া শব্দজোড়ের ভিত্তিতে ১নং রূপকৌশলের সৃষ্টি হতে পারে কোনো বাংলাভাষীর রূপতাত্তিক মডিউলে। একইভাবে যদি কোনো বাংলাভাষীর শব্দকোষে অর্থগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট এমন কমপক্ষে দুটি শব্দজোড় থাকে: ক) যার মধ্যে প্রত্যেক জোড়ে একটি বিশেষণ আর অন্যটি বিশেষ্য; খ) বিশেষণদু'টি 'ইত' দিয়ে শেষ হয় এবং বিশেষ্যদু'টি শেষ হয় 'অয়' দিয়ে, তবে সেই দু'টি শব্দজোড়ের ভিত্তিতে সেই বাংলাভাষীর রূপতাত্ত্বিক মডিউলে ২নং রূপকৌশলের সৃষ্টি হবে।

রূপকৌশলের দ্বিমুখী তীরের দুই দিকে থাকে দুটি পূর্ণ শব্দ। /X/ (সুর) বা /X'/ (সুরেলা)– এই দুই শব্দের যে কোনো একটি জানলেই ১. আপনি অন্যটি গঠন করতে পারবেন, বা ২. কেউ এই দুই শব্দের মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করলে শব্দটি আগে থেকে জানা না থাকলেও আপনি শব্দটি বুঝতে পারবেন, বা ৩. এ রকম একটি শব্দ মনে থাকলে অন্যটি স্মরণ করতে পারবেন, যদি প্রয়োজন হয়। দ্বিমুখী তীরের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে রূপকৌশল বাম অথবা ডান এই উভয় দিক থেকে ক্রিয়াশীল হতে পারে। বামদিক থেকে দেখলে ১নং রূপকৌশলে 'সুর' আর 'রোদ' হচ্ছে রূপকৌশলের **যোগান** (Input); 'সুরেলা' আর 'রোদেলা' হচ্ছে **উৎপাদন** (Output)। ডানদিক থেকে দেখলে 'সুরেলা' আর 'রোদেলা' হচ্ছে যোগান; 'সুর' আর 'রোদ' হচ্ছে উৎপাদন।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে /X/ এবং /X'/-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য রয়েছে: ক. রূপগত এবং খ. পদগত। ডান দিকের X এর উপর ' তিলক (ইংরেজিতে এর নাম প্রাইম) চিহ্নটি রূপগত পার্থক্যের দ্যোতক। ১নং রূপকৌশলে তিলকের মান হচ্ছে ∅/এলা, অর্থাৎ শব্দজোড়ের একটি শেষ হবে 'এলা' দিয়ে কিন্তু অন্যটিতে 'এলা'র জায়গায় থাকবে শূন্য বা ∅। ২নং রূপকৌশলে (') = ইত/অয়, অর্থাৎ শব্দজোড়ের একটি শেষ হবে 'ইত' দিয়ে, কিন্তু অন্যটিতে 'ইত' এর জায়গায় থাকবে 'অয়'। তীর্যক বার এর নীচের দিকে α (গ্রীক বর্ণ আলফা) আর β (গ্রীক বর্ণ বেটা) চিহ্ন দুটি পদগত পার্থক্যের দ্যোতক। এর মানে হচ্ছে, প্রতিটি শব্দজোড়ের দুই দিকের দুই শব্দ ভিন্ন দু'টি পদ এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন 'সুর' আর 'পরাজয়' বিশেষ্য, 'সুরেলা' আর 'পরাজিত' বিশেষণ।

৩. $/C_iiC_j/_{বি}$ ↔ $/C_iOiC_jik/_{বিণ}$
দিন ↔ দৈনিক; চিন ↔ চৈনিক

৪. $/\sigma'\sigma/_{ক্রিয়া}$ ↔ $/'\sigma\sigma/_{বিশেষ্য}$
im'port ↔ 'import; pro'test ↔ 'protest

৫. $/X/_{বিণ\ এক}$ ↔ $/XX/_{বিণ\ বহু}$
বড় ↔ বড়বড়; সবুজ ↔ সবুজ সবুজ

৬. $/X/_{পুরাঘটিত\ অসমাপিকা}$ ↔ $/X/_{সাধারণ\ বর্তমান/নামপুরুষ}$
করে ↔ করে; শুনে ↔ শুনে

৩নং উদাহরণে যোগান শব্দের i উৎপাদন শব্দে oi দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর পর উৎপাদনের সাথে -ইক যুক্ত হয়েছে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে যোগান ও উৎপাদনের মধ্যে দুই রকম রূপগত পার্থক্য রয়েছে: ১) i/oi এবং ∅/ইক। ৩-৪ উদাহরণের পার্থক্য হচ্ছে প্রাণবিক (Phonemic) বা সাঙ্গ (Segmental) পার্থক্য। ৪নং উদাহরণে আছে অনঙ্গ (Suprasegmental) পার্থক্য: উৎপাদন ও যোগান শব্দে গমক (Stress) একই অক্ষরে পড়েনি। ৫নং উদাহরণে যোগানের শব্দটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ৬নং উদাহরণে যোগান ও উৎপাদনের মধ্যে কোনো রূপগত পার্থক্য নেই, শুধু পদগত পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে শব্দগঠনের সব প্রক্রিয়ায় যোগানশব্দের সাথে কোনো কিছু যোগ করার ব্যাপার নেই, অর্থাৎ তথাকথিত বিভক্তি-প্রত্যয়-উপসর্গ যুক্ত না করেও শব্দ গঠন করা যেতে পারে।

১.৩. চলক ও ধ্রুবক

এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোকে কোনো রূপকৌশলে প্রক্ষেপ করলে শব্দগুলো **চলক** (Variable) ও **ধ্রুবক** (Constant) – এ দু'টি উপাদানে বিশ্লেষিত হয়। চলক হচ্ছে শব্দের সেই উপাদান যা পরিবর্তিত হয়, ধ্রুবক হচ্ছে শব্দের সেই উপাদান যা স্থির থাকে। ১নং রূপকৌশলে প্রক্ষেপ করলে 'সুরেলা' শব্দে চলক হবে 'সুর', ধ্রুবক হবে 'এলা'। ২নং রূপকৌশলে প্রক্ষেপ করলে 'পরাজিত' শব্দে চলক হবে 'পরাজ', ধ্রুবক হবে 'ইত'। রূপকৌশলে চলক উপাদানটি সাধারণত দেখানো হয় X চিহ্ন দিয়ে। ১ আর ৫-৬নং রূপকৌশলের চলকের তুলনা করলে আমরা দেখবো যে ৫-৬নং রূপকৌশলের চলক পুরোপুরি অবিশেষায়িত (Unspecified) আর ১নং রূপকৌশলের চলক অংশত বিশেষায়িত (Specified): /XC/, যার মানে হচ্ছে এই রূপকৌশলের চলক অবশ্যই শেষ হবে ব্যঞ্জন-প্রণব দিয়ে। ৭নং রূপকৌশলের চলক /XV/, যার মানে হচ্ছে এই চলক সবসময় স্বরান্ত হবে।

৭. $/XV/_{বি}$ ↔ $/XVkOr/_{বি}$
চিত্র ↔ চিত্রকর; জাদু ↔ জাদুকর

চলক সম্পূর্ণভাবে বিশেষায়িত হতে পারে। ৩নং রূপকৌশলের চলক /C_iiC_j/, যার মানে হচ্ছে এই রূপকৌশলের চলক শুরু হবে একটি ব্যঞ্জন প্রণব দিয়ে, শেষ হবে অন্য একটি ব্যঞ্জন প্রণব দিয়ে। ৮নং রূপকৌশলে বামদিকের যোগান শব্দ 'নড়' এর ধ্রুবক হচ্ছে /O/আর দুই দিকের দুই ব্যঞ্জনপ্রণব হচ্ছে চলক। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে 'নড়' শব্দে ধ্রুবক চলককে ভেদ করে তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

৮. /C_iOC_j/$_{\text{ক্রি, আদেশ, সাধা বর্ত}}$ ↔/C_iaC_j/$_{\text{ক্রি, আদেশ, প্রযো}}$
নড় ↔ নাড়; মর ↔ মার

সেমেটিক গোত্রের ভাষা যেমন আরবি ও হিব্রুতে বেশির ভাগ রূপকৌশল ৮ বা ৩-এর মতো। আরবি 'কুতুব' শব্দ থেকে 'কিতাব' শব্দ গঠন করা যায় যে রূপকৌশল দিয়ে: /C_iuC_juC_k/ ↔ C_iiC_jaC_k/' সেই রূপকৌশলের বামদিকের যোগান 'কুতুব' শব্দের চলক /C_i-C_j-C_k/ এবং ধ্রুবক /-u-u-/ পরস্পরের সাথে মিশে আছে। যেহেতু ধ্রুবক ও চলকের অখণ্ডতা (Integrity) বলে কিছু নেই সেহেতু এগুলোকে শব্দের অংশ (Word part) না বলে শব্দের **উপাদান** (Word subcomponent) বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এর কারণ, অংশ মাত্রেরই একটি বহিঃসীমা থাকে, উপাদানের ক্ষেত্রে সে ধরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যয়, 'বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি শব্দের অংশ কারণ এগুলোর নির্দিষ্ট বহিঃসীমা আছে, শব্দের বাইরেও এগুলোর আলাদা অস্তিত্ব আছে। রূপতত্ত্বের বেশির ভাগ পাণিনীয় মডেলে প্রত্যয়, উপসর্গ ও বিভক্তির সুনির্দিষ্ট তালিকা আছে। অখণ্ড রূপতত্ত্বে ধ্রুবক ও চলকের কোনো তালিকা নেই। এ রকম তালিকা করা অসম্ভব, কারণ শব্দের বাইরে পরিবর্তক বা ধ্রুবকের আলাদা কোনো অস্তিত্বই নেই। ন্যুনতম দু'টি শব্দজোড়ের মধ্যে একটি যদি কোনো কারণে হারিয়ে যায় শব্দকোষ থেকে তবে রূপকৌশলটিও হারিয়ে যায়, রূপতাত্ত্বিক উপাঙ্গ থেকে এবং সংশ্লিষ্ট রূপকৌশলের সাথে সাথে প্রক্ষেপযোগ্য শব্দের ধ্রুবক আর চলকও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

আমরা উপরে দেখেছি, ধ্রুবক সাঙ্গ (Segmental) হতে পারে (অর্থাৎ প্রণব (Phoneme), প্রণবক্রম, দিয়ে গঠিত); ধ্রুবক অনঙ্গ (Supra-segmental) হতে পারে (অর্থাৎ গমক (Stress), তান (Tone) ইত্যাদি দিয়ে গঠিত)। শুধু অনঙ্গ উপাদান যেমন, গমক বা তান চলক হতে পারে না। কোনো কোনো সময় চলক বা ধ্রুবকের সাথে ধাতু/শব্দ বা প্রত্যয়ের চেহারা টায়ে টায়ে মিলে যেতে পারে কিন্তু এ মিল একান্তই কাকতালীয়। আমরা উপরেও দেখেছি, চলক 'বিন' বা 'পরাজ' ধাতু নয়। শব্দই সাধারণত চলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, 'সুর' বা 'রোদ'। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও প্রচুর, যেমন, 'বিন' বা 'পরাজ' শব্দ নয়। অনেক সময় ভাষাকোষের কোনো পূর্ণ শব্দের সাথেও মিল থাকতে পারে ধ্রুবকের। '

৯নং রূপকৌশলের 'বক্ষদেশ' বা 'উদরদেশ' শব্দে যে 'দেশ' আছে তার সাথে মিল আছে পূর্ণ শব্দ 'দেশ' (Country)-এর। কিন্তু 'শরীরের অংশ' অর্থে 'দেশ' ধ্বনিক্রমটি ব্যবহার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ডাক্তার তার রোগীকে প্রশ্ন করতে পারেন না: *বলুন দেখি, আপনার শরীরের কোন কোন দেশে ব্যথা? এ থেকে বোঝা যায় যে 'বক্ষদেশ' এর 'দেশ' আর পূর্ণ শব্দ 'দেশ' (Country)-কে এক বলে মনে হলেও 'বক্ষদেশ' এর 'দেশ' আসলে পূর্ণ শব্দ নয়। 'বক্ষ' বলে একটি শব্দ আছে বাংলায়, 'বক্ষদেশ' বলে অন্য একটি শব্দও আছে। 'বক্ষদেশ' শব্দ থেকে 'বক্ষ' শব্দক্রমটি বাদ দিলে বাকি থাকে: দেশ। কিন্তু এই 'দেশ' যেহেতু শব্দ নয়, সেহেতু এটা আসলে কোথাও নেই, নিছক প্রণবক্রম হিসেবে আছে 'বক্ষদেশ' শব্দের অভ্যন্তরে। 'বঙ্গ' শব্দে 'অঙ্গ' আছে বলা যেমন অর্থহীন, 'বক্ষদেশ' শব্দে 'দেশ' আছে বলাও তেমনই অর্থহীন।

৯. /X/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔/XdeS/$_{\text{বিশেষ্য}}$
বক্ষ ↔ বক্ষদেশ; উদর ↔ উদরদেশ

একবার যদি কোনো পূর্ণ শব্দ ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনো রূপকৌশলে তবে অখণ্ড রূপতত্ত্বমতে সেটি আর পূর্ণ শব্দ থাকে না। ধীরে ধীরে এর অর্থগত পরিবর্তন ঘটে (দেশ>দেশ) এবং এর পর ঘটে ধ্বনিগত বা রূপগত পরিবর্তন: (১০ নং রূপকৌশলের) ঘোড়া> ঘোড়্। রূপগত পরিবর্তন এক সময়ে এমন এক পর্যায়ে যায় যে অনেক রূপকৌশলের ধ্রুবক দেখে বলার উপায় থাকে না যে সেটি কোনো এক কালে শব্দ ছিল। যেমন, ১নং রূপকৌশলের ধ্রুবক 'এলা'র উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে তা বলা মুস্কিল। এই প্রক্রিয়াটির নাম 'বৈয়াকরণিকীকরণ' (Grammaticalization)। কোনো শব্দ যদি কোনো রূপকৌশলে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে শব্দটির বৈয়াকরণিকীকরণ শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

১০. /X/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /ghOrX/$_{\text{বিশেষ্য}}$
দৌড় ↔ ঘোড়দৌড়; সওয়ার ↔ ঘোড়সওয়ার

অখণ্ড রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ হচ্ছে ন্যুনতম ভাষিক একক। অখণ্ড রূপতত্ত্বের মত হচ্ছে এই যে রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের অভ্যন্তরে এমন কোনো ভাষিক এককের অস্তিত্ব থাকতে পারে না যেগুলোর মধ্যে ক্ষমতাক্রমিক নির্ভরতার সম্পর্ক থাকতে পারে। ক্ষমতাক্রমিক নির্ভরতার সম্পর্ক মানে কী? বাক্য কাঠামোতে এ ধরণের সম্পর্কের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। বাক্যের সব অংশের গুরুত্ব সমান নয়, কোনো অংশ অপরিহার্য, কোনোটি বা নয়। কোনোটি শির (Head), কোনোটি শিরের পূরক (Complement), বিশেষক (Specifier) বা প্রসারক (Modifier)। 'ঋক একটি মজার বই পড়ে' বাক্যে 'বই' হচ্ছে 'পড়ে' ক্রিয়ার পূরক। 'মজার' হচ্ছে 'বই' এর প্রসারক। শিরের সঙ্গে পূরক ও প্রসারকের 'নির্ভরতা'র (Dependency) সম্পর্ক আছে: শির নেইতো পূরকও নেই, বিশেষকও নেই, প্রসারকও নেই। এর মানে হচ্ছে, বাক্যের ক্ষমতাক্রমিক আন্তর্গঠন আছে। আসলে বৈন্যাসিক কাঠামো মাত্রেই ক্ষমতাক্রমিক (Hierarchical)। শব্দের অভ্যন্তরে ধ্রুবক বা চলক– এই দু'টি উপাদানের প্রত্যেকটির মান সমান, কোনো একটি উপাদান অন্য কোনো উপাদানের উপর নির্ভর করে না। শব্দের কোনো অংশ যেহেতু নেই, সেহেতু শব্দের মধ্যে কোনো ফাটল বা জোড়া নেই। শব্দ ফাটলহীন (Seamless), অখণ্ড (Whole), অটুট। এ থেকেই 'অখন্ড রূপতত্ত্ব' নামকরণ।

প্রথাগত ও আণবিক ব্যাকরণ অনুসারে 'মামা' মৌলিক শব্দ, কারণ এই শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অন্য কোন শব্দ পাওয়া যায় না। 'বন্ধুত্ব' সাধিত শব্দ, কারণ এ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা 'বন্ধু' শব্দটি পেতে পারি। 'পরাজয়'ও সাধিত শব্দ, কারণ এই শব্দটি 'জয়' এর বামদিকে {পরা} উপসর্গ যোগ করে গঠন করা হয়েছে। অখণ্ড রূপতত্ত্ব অনুসারে 'মামা', 'বন্ধুত্ব' ও 'পরাজয়' এই তিনটি শব্দই রূপকৌশল ব্যবহার করে গঠন করা যেতে পারে। 'মামা' শব্দটি গঠন করা যেতে পারে 'মামী' থেকে (১০)। 'বন্ধু' শব্দটি গঠন করা যেতে পারে 'বন্ধুত্ব থেকে (১১)। এছাড়া অখণ্ড রূপতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেক তথাকথিত অশুদ্ধ শব্দ, যেমন 'উপরোক্ত', শুদ্ধ শব্দ বলে পরিগণিত হতে পারে।

১১. /Xa/$_{\text{বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ}}$ ↔ /Xi/$_{\text{বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ}}$
মামা ↔ মামী; চাচা ↔ চাচী

১২. /XV/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /XVtto/$_{\text{বিশেষ্য}}$
বন্ধু ↔ বন্ধুত্ব; মনুষ্য ↔ মনুষ্যত্ব

১৩. /Xe/$_{\text{অনুসর্গ}}$ ↔ /Xokto/$_{\text{বিশেষণ}}$
উপরে ↔ উপরোক্ত; পূর্বে ↔ পূর্বোক্ত

যেহেতু সব ধরণের শব্দ, সে যৌগিকই হোক আর মৌলিকই হোক, রূপকৌশল ব্যবহার করে গঠন করা যায়, সেহেতু মৌলিক ও সাধিত শব্দের পার্থক্যটি রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। রূপতত্ত্বের পাণিনীয় ধারায় শব্দগঠনের সর্বমোট তিন ধরণের নিয়মের কথা বলা হয়ে থাকে: ১. উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্তকরণ (Affixation), ২. সমাস (Compound) ও ৩. বীপ্সা বা দ্বিরুক্তি (Reduplication)। যদি প্রত্যয়সাধিত ('সুরেলা', 'দৈনিক'), সমাসবদ্ধ ('প্রেমপত্র', 'ঘোড়দৌড়') ও দ্বিরুক্ত ('বড় বড়')– এই তিন শ্রেণীর শব্দকে শব্দগঠনের একই সূত্র: $/X/_{\alpha} \leftrightarrow /X'/_{\beta}$ দিয়ে গঠন করা যায় বা বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ব্যাকরণে সমাস বা প্রত্যয়/উপসর্গ নিয়ে আলোচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

১.৪. রূপতত্ত্ব ও শব্দকোষ

ফোর্ড ও অন্যান্য (১৯৯৭) প্রস্তাবিত অখণ্ড রূপতত্ত্ব অনুসারে শব্দকোষে শুধু শব্দ আছে, শব্দের চেয়ে ছোট কোনো কিছু যেমন, ধাতু, অঙ্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি... শব্দকোষে নেই, তবে শব্দের চেয়ে বড় কোনো বস্তু যেমন, বাগধারা বা বাগবিধি থাকতে পারে। কিন্তু সব শব্দই কি শব্দকোষে থাকা অপরিহার্য? সবগুলো রূপকৌশলের অস্তিত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শব্দজোড় গঠন করতে যত শব্দ দরকার তার বেশি শব্দ শব্দকোষে থাকার প্রয়োজন নেই। যেসব শব্দ কোনো রূপকৌশল দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয় যেমন, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বা 'অঘটনঘটনপটিয়সী' সেগুলো শব্দকোষে থাকতেই হবে।

'ভীত', 'উদরদেশ', 'কুমারীত্ব', – এই তিনটি শব্দ শব্দকোষে থাকা অপরিহার্য নয়, কারণ শব্দকোষে অন্তর্ভুক্ত 'ভয়', 'নিয়োগ' ও 'উদর' যথাক্রমে (২), (৯) ও (১২) নং রূপকৌশলে প্রক্ষেপ বা ম্যাপ করে ঐ শব্দগুলো গঠন করা যায়। 'শত্রুত্ব', 'প্রস্থিত' শব্দগুলো অনেকের শব্দকোষে নেই, কিন্তু যথাক্রমে (১২) ও (১৫) রূপকৌশল দিয়ে এই শব্দদুটি তৈরি করা সম্ভব। এই শব্দগুলো বাক্যে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না সে প্রশ্ন অবান্তর। রূপতত্ত্বের কাজ বক্তার প্রয়োজনমতো শব্দ তৈরি করে দেয়া, বক্তা শব্দগুলো ব্যবহার করবেন কি করবেন না তা রূপতত্ত্বের বিচার্য নয়।

১৫. $/Xan/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /Xito/_{\text{বিশেষ্য}}$
অনুষ্ঠান ↔ অনুষ্ঠিত; স্থান ↔ স্থিত

রাজেন্দ্র সিংহ যখন শব্দকোষের কথা বলেন তখন তিনি প্রতিটি ব্যক্তির আলাদা শব্দকোষের দিকে ইঙ্গিত করেন। বাংলাভাষীর সংখ্যা যদি কমবেশি ২৫ কোটি হয় তবে পৃথিবীতে ২৫ কোটি আলাদা বাংলা শব্দকোষ আছে। এই শব্দকোষগুলোর প্রত্যেকটি স্বতঃপরিবর্তনশীল। যে কোনো ব্যক্তির সকালের শব্দকোষ আর বিকেলের শব্দকোষ ঠিক এক নাও হতে পারে, কারণ এই সময়ের মধ্যে যে নতুন কোনো শব্দ তার শব্দকোষে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, বর্তমান লেখকের ব্যক্তি শব্দকোষে 'আফাল' শব্দটি আছে যা অন্য অনেক বাংলাভাষীর শব্দকোষে সম্ভবত নেই, বাংলাভাষার অনেক অভিধানেও হয়তো নেই। 'আফাল' মানে 'সিলেটের হাওড় অঞ্চলের বড় বড় ঢেউ'। যদি এমন হয় যে এ প্রবন্ধটি পড়ার আগে আপনি এ শব্দটি জানতেন না, এইমাত্র জানলেন, তবে তার মানে দাঁড়াবে এই যে এই বিশেষ মুহূর্তে আপনার শব্দকোষটি কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হলো।

'শব্দকোষ' (Lexicon), 'অভিধান' (Dictionary) এক কথা নয়। অভিধান বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর নির্বাচিত কিছু শব্দের সংগ্রহ। কোন কোন শব্দ সেই সংগ্রহে থাকবে, অপশব্দ বা গালাগালিগুলো থাকবে কি থাকবে না, কারিগরি জগতের শব্দ বা উপভাষাগুলোর কোনো শব্দ অভিধানে থাকবে কি থাকবে না অভিধান সঙ্কলকেরাই তা নির্ধারণ করে থাকেন। একজন ব্যক্তির শব্দকোষে বহু লক্ষ শব্দ আছে এবং আরও বহু লক্ষ শব্দ ব্যক্তি প্রয়োজনে তৈরি করে নিতে পারে। কোনো অভিধান-রচয়িতার পক্ষেই এত এত শব্দ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই

রাজেন্দ্র সিংহ (২০০১:৪৭৬) বলেন: "এমনটি কখনো বলবেন না যে অমুক শব্দটি শব্দকোষে নেই। বরং বলুন, কার শব্দকোষের কথা বলছেন!"

প্রত্যেকের মস্তিষ্কে যদি আলাদা আলাদা শব্দকোষ থাকে তবে কিভাবে এক বাংলাভাষী অন্য বাংলাভাষীর কথা বুঝতে পারে? বুঝতে পারে এই জন্যে যে যে কোনো দুই জন বাংলাভাষীর শব্দকোষে বেশ কিছু সাধারণ (Common) শব্দ আছে। ২৫ কোটি বাংলাভাষীর শব্দকোষেও কিছু সাধারণ শব্দ আছে। এই সাধারণ শব্দগুলোর কারণেই দুই বাংলাভাষী বা সব বাংলাভাষী একে অপরের সাথে ভাববিনিময় করতে পারে। ২৫ কোটি শব্দকোষের সমষ্ঠিকে কি বাংলা শব্দকোষ বা বাংলা **সামাজিক শব্দকোষ** (Social lexicon)বলা যাবে না? ২৫ কোটি বাংলাভাষীর স্বতঃপরিবর্তনশীল শব্দকোষকে একত্র করার কাজটি অকল্পনীয়– মহাবিশ্বের চতুঃসীমা কল্পনা করার মতোই অসম্ভব একটি ব্যাপার। বাংলা শুধু নয়, পৃথিবীর কোনো ভাষার বৃহত্তম অভিধানটিও সেই ভাষাভাষী সব মানুষের শব্দকোষের সব শব্দকে ধারণ করতে পারে না।

২.১. ধ্বনিতত্ত্ব

রাজেন্দ্র সিংহের ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাবনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা বাংলা ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তনের তিনটি নিয়ম ব্যবহার করবো।

১নং নিয়ম: [+ মহাপ্রাণ] → [– মহাপ্রাণ]
উদাহরণ: বাঘ → বাগ; লাভ → লাব; পথ → পত

২নং নিয়ম:
[[+ ব্যঞ্জন, + শিস], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ]] → [[+স্বর, + উচ্চ], [+ ব্যঞ্জন, + শিস], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ]]
উদাহরণ: স্কুল → ইস্কুল

৩নং নিয়ম: [+ ব্যঞ্জন, + শিস, তালব্য]→ [+ ব্যঞ্জন,+ শিস, দন্তমূলীয়]
উদাহরণ: সন্ত্রাস → সন্ত্রস্ত

(ধ্বনিপরিবর্তনের ৩নং নিয়মে 'সন্ত্রাস' শব্দের সর্বশেষ তালব্য 'শ'-টি প্রত্যয় 'সন্ত্রস্ত' শব্দে 'ত' এর উপস্থিতিতে দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হয়। 'সন্ত্রাস' শব্দের প্রথম ও শেষ বর্ণ দন্ত্য 'স', কিন্তু এদের উচ্চারণ তালব্য 'শ')

ধ্বনিতত্ত্বের বেশির ভাগ মডেলে প্রতিটি ভাষিক বস্তু, যেমন শব্দ, বর্গ (Phrase) বা বাক্যের দু'টি স্তর আছে বলে দাবি করা হয়: ১. **অন্তর্লীন স্তর** (Underlying structure) আর ২. **ভূমিস্তর** (Surface structure)। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি বৈয়াকরণিক প্রক্রিয়া (Operation) দুটি পৃথক বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে: **যোগান** (Input) ও **উৎপাদন** (Output)। ১ ও ২নং নিয়মে 'বাঘ' আর 'স্কুল' হচ্ছে যোগান; 'বাগ' আর 'ইস্কুল' হচ্ছে উৎপাদন। অন্তর্লীন স্তরে যা 'বাঘ' তা ভূমিস্তরে এসে হয়ে যায় 'বাগ'। এর মানে হচ্ছে, বাংলায় অক্ষরের (Syllable) উপধায় (Coda) মহাপ্রাণ প্রণব (Aspirated Phoneme) অল্পপ্রাণ প্রণবে (Unaspirated Phoneme) পরিণত হয়। বাংলায় আমরা লিখি 'বাঘ', 'লাভ', 'পথ', কিন্তু সাধারণত উচ্চারণ করি 'বাগ', 'লাব', 'পত'। একইভাবে, অন্তর্লীন স্তরে যা (সম্ভবত) 'স্কুল' ভূমিস্তরে এসে তা হয়ে যায় 'ইস্কুল' এবং অন্তর্লীণ স্তরের 'সন্ত্রাশ+তো' ভূমিস্তরে এসে 'সন্ত্রস্ত' হয়ে যায়।

রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৮৪, ১৯৯০) প্রস্তাবিত সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল (Generative Phonotactic) তত্ত্ব অনুসারে কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনার জন্যে দরকার দুটি জিনিষ: ১) **প্রাণবিক বর্ণমালা** (Phonemic alphabet বা List of phonemes) আর ২) সুগঠন শর্তের (Well-formedness condition) তালিকা। প্রতিটি সুগঠন শর্ত স্বয়ংক্রিয়,

সর্বব্যাপী, প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ (Context-free), অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে কোনো সুগঠন শর্ত লঙ্ঘন করা যায় না। যদি কোনো প্রণবক্রম কোনো ভাষার কোনো একটি সুগঠন শর্ত ভঙ্গ করে তবে সে প্রণবক্রমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেরামত হয়ে যায়। মেরামতের তিনটি সার্বজনীন (বা বিশ্বজনীন) কৌশল (Strategy of repair) রয়েছে:

১. **প্রতিস্থাপন** (Substitution) অথবা **সমীভবন** (Assimilation)

২.**স্বরভক্তি** (Epenthesis) এবং

৩. **ধ্বনিলোপ** (Deletion)

সংশ্লিষ্ট ধ্বনিক্রমের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশ (Phonological context) আর সংশ্লিষ্ট ভাষার মর্জির উপর নির্ভর করে এই তিনটি মেরামত-কৌশলের যে কোনো একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়। নিচে সুগঠন শর্তের একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সুগঠন শর্ত-১
*উপধা
[+ ব্যঞ্জন, + মহাপ্রাণ]

১নং সুগঠন শর্তের অর্থ হচ্ছে, অক্ষরের উপধায় উষ্ম ব্যঞ্জন প্রণব থাকা অসম্ভব। 'বাঘ', 'লাভ', 'লাখ' ইত্যাদি শব্দের অন্তর্লীন স্তরে উপধায় একটি উষ্ম প্রণব রয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এসব শব্দের অন্তর্লীন স্তরের প্রণবক্রম ১নং সুগঠন শর্তকে অমান্য করে। যেহেতু কোনো সুগঠন শর্ত অমান্য করা যায় না সেহেতু ধ্বনিতত্ত্ব নিজে থেকেই শর্ত-অমান্যকারী প্রণবক্রমগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়। মেরামতের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে:

১. অন্তর্লীণ স্তরের **কাঠামো-রক্ষা** (Structure preserving) হতে হবে, এবং
২. সর্বনিম্ন আয়াসসাধ্য কৌশলটি কার্যকর হবে।

অন্তর্লীন স্তরের কাঠামো-রক্ষা করতে হলে অন্তর্লীণ স্তরের কাঠামোতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিবর্তন আনা যাবে না। যেমন, 'বাঘ' এর উপধা লুপ্ত হয়ে ভূমিস্তরে আমরা 'বা' পাচ্ছি না, কারণ সেক্ষেত্রে আন্তকাঠামোর এত বেশি পরিবর্তন হয় যে কাঠামোটি আর 'বাঘ' বলে চেনাই যায় না। 'বাঘ' ভূমিস্তরে 'বাক' হচ্ছে না, কারণ, 'ঘ' প্রণব 'গ'-তে পরিণত হওয়া সর্বনিম্ন আয়াসসাধ্য। 'ঘ'-কে 'ক'-তে পরিণত করতে হলে দুই দু'টি স্বলক্ষণ বদলাতে হবে: 'ঘ'-কে প্রথমে 'গ'-তে এবং তার পর 'গ'-কে 'ক'-তে পরিণত করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে: অন্তর্লীন স্তরে যে 'ঘ' আছে অর্থাৎ 'বাঘ' শব্দটি যে অন্তর্লীন স্তরে 'গ' দিয়ে শেষ হয় না, তার কি প্রমাণ আছে? প্রমাণ এই যে 'বাঘের' বলার সময় আমরা *'বাগের' বলি না। 'বাঘের' শব্দটি দ্ব্যক্ষর এবং 'ঘ' প্রণবটি রয়েছে দ্বিতীয় অক্ষরের সূচনায়। একাক্ষর 'বাঘ' শব্দে 'ঘ' ধ্বনিটি রয়েছে অক্ষরের উপধায়। মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন প্রণব অক্ষরের সূচনায় থাকতে বাধা নেই।

ধ্বনিপরিবর্তনের ২নং নিয়মটি প্রতিফলিত হয়েছে নিচের ২নং সুগঠন শর্তে। এতে দেখানো হয়েছে, অক্ষরের সূচনায় এমন দু'টি ব্যঞ্জন প্রণব থাকতে পারবে না যার প্রথমটি একটি শিষ ব্যঞ্জন-প্রণব ('শ' বা 'স')। সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্বের আলোকে দাবি করা যেতে পারে যে যেহেতু অক্ষরের সূচনায় 'স্ক' ধ্বনিখণ্ডটি বাংলার সুগঠন শর্ত লঙ্ঘন করছে, আবার 'স্কুল' শব্দটি বাংলাভাষীকে উচ্চারণও করতে হবে– এই উভয় মুস্কিলের আসান করতে মেরামত-কৌশল স্বরভক্তি কার্যকর হয় অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ডটির আগে একটি 'ই' স্বরপ্রণবের আগমন ঘটে। এর ফলে একাক্ষর 'স্কুল' দ্ব্যক্ষর শব্দে পরিণত হয়।

সুগঠন শর্ত-২	
*সূচনা	
ব্যঞ্জন-১	ব্যঞ্জন-২
[+ শিস]	

একজন পাঞ্জাবি-ভাষী যখন School শব্দটি উচ্চারণ করতে যায় তখন শব্দটি হয়ে যায় 'সকুল'। লক্ষ্যনীয় যে বাংলা আর পাঞ্জাবি– এই উভয় ভাষাতেই স্বরভক্তি দিয়ে গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমটি মেরামত হয়ে দুই অক্ষরে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু দুই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: ১. স্বরভক্তির জন্যে একই প্রণব ব্যবহার করা হচ্ছে না, এবং ২. স্বরভক্তি প্রযুক্ত হবার স্থানটিও এ দু'টি ভাষায় আলাদা– বাংলায় গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমের আগে আর পাঞ্জাবিতে সূচনার ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুই প্রণবের মাঝখানে। নিউজিল্যান্ডের ভাষা ওয়ালপিরিতে School শব্দটি হয়ে যায় 'কুল', কারণ ওয়ালপিরির প্রাণবিক বর্ণমালায় 'স' প্রণবটিই নেই এবং ওয়ালপিরির ধ্বনিতত্ত্ব অক্ষরের সূচনায় কোনো প্রকার ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ অনুমোদন করে না। সুতরাং ওয়ালপিরিতে ধ্বনিলোপের মাধ্যমে গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমটি মেরামত করা হয়।

২.২. ধ্বনিপরিবর্তনের সর্বব্যাপী ও প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়ম

ধ্বনিপরিবর্তনের ১নং নিয়মের সঙ্গে ৩নং নিয়মের পার্থক্য কি? ১নং নিয়মটির কোনো ব্যতিক্রম নেই। তৃতীয় নিয়মটির ব্যতিক্রম রয়েছে– 'ত' এর অগ্রবর্তি শিস তালব্য প্রণব সব ক্ষেত্রে 'স'-তে পরিণত হয় না। 'হাসা' আর 'হাসতো' বা 'মাসি' আর (বাংলাদেশে) 'মাসতুতো' শব্দের উচ্চারণের তুলনা করলে আমরা দেখবো যে ধাতু √হাস কিংবা প্রাতিপদিক 'মাসি"র অন্তে অবস্থিত তালব্য শীষ প্রণবের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না যদিও এসব শব্দে তালব্য 'শ' প্রণব {তুতো} বা {তো} প্রত্যয়ের 'ত' প্রণবের এর অগ্রবর্তি হচ্ছে: হাস+ তো; মাসি+তো।

আমরা দেখলাম, ৩নং নিয়মটি কেবলমাত্র 'সন্ত্রস্ত' এর মতো বিশেষ কিছু শব্দ গঠনের সময় ক্রিয়াশীল হয় এবং সে কারণে নিয়মটি 'সর্বব্যাপী' (Automatic) নয়, একান্তভাবে বিশেষ 'প্রতিবেশ নির্ভর' (Context-sensitive)। ধ্বনিপরিবর্তনের ১নং নিয়ম যে ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে – এ নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ৩নং নিয়মটিকে ব্যাকরণের কোন উপাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হবে? রাজেন্দ্র সিংহের Question of Domain। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা তিন তিনটি আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন: প্রথম দল বলেন, নিয়মটি ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; দ্বিতীয় দল দাবি করেন, ৩নং নিয়মের উপযুক্ত স্থান রূপতত্ত্ব। তৃতীয় দল দাবি করেন, এ ধরণের নিয়মের স্থান হওয়া উচিত 'রূপধ্বনিতত্ত্ব' (Morphonology বা Morphophonology) নামে আলাদা একটি উপাঙ্গে। রাজেন্দ্র সিংহের মতে, ৩নং নিয়মটি রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কীভাবে সেটা করা যেতে পারে? নিচের রূপকৌশলটি দিয়ে 'সন্ত্রস্ত' গঠিত হলেই ৩নং নিয়ম রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩. /Xআশ/$_{বি}$ ↔ /Xঅন্ত/$_{বিণ}$
বিন্যাস ↔ বিন্যস্ত; সন্ত্রাস ↔ সন্ত্রস্ত

ফোর্ড ও অন্যান্য (১৯৯৭) ৩নং নিয়মকে রূপতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করার কয়েকটি কারণ দেখিয়েছেন:

প্রথমত, ধ্বনিপরিবর্তনের যে সব নিয়ম বিশেষ রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশে ক্রিয়াশীল হয় সেগুলো কখনই দ্বিতীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্বকে প্রভাবিত করে না। ধরুন, বাংলাভাষী অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে অভ্যস্ত নয় বলে

ইংরেজি বলার সময়ও তারা সতর্ক না হলে 'বাগ' বা 'লাব' এর মতো Bath বা Faith এর উচ্চারণ করে থাকে যথাক্রমে 'বাত' ও 'ফেইত'। কিন্তু Fishtail বা Bushtown (কাল্পনিক শব্দ) বলার সময় তারা 'সন্ত্রস্ত' বা 'বিন্যস্ত' এর অনুকরণে দন্ত্য বা দন্তমূলীয় 'ত/ট' এর অগ্রবর্তি স্থানে 'শ' এর পরিবর্তে 'স' উচ্চারণ করবে না, অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি, তারা *'ফিস্টেইল' বা *'বুস্টাউন' উচ্চারণ করবে না, 'ফিশটেইল' ও 'বুশটাউন' উচ্চারণ করবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণের কালানুক্রমিক ইতিহাসে দেখা গেছে, ১নং নিয়মের মতো সর্বব্যাপী নিয়মগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি কালের প্রবাহে ৩নং নিয়মের মতো প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়মে পরিণত হয়। কোনো প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়ম সর্বব্যাপী নিয়মে পরিণত হওয়া বিরল ঘটনা।

তৃতীয়ত, শিশুরা যখন কোনো ভাষা শিখে তখন তারা প্রথমেই শেখে ১নং নিয়ম এবং পরে তারা ৩নং নিয়ম অর্জন করে। কোনো প্রকার শব্দকোষের অধিকারী হওয়ার আগেই অন্যদের উচ্চারণ শুনে শুনে শিশুদের ধ্বনিতাত্ত্বিক বোধ তৈরি হয়ে যায়। তারা বুঝে যায়, বাংলা শব্দ বা অক্ষরের কোন অবস্থানে কি কি করা যাবে বা যাবে না। যেমন আগে কখনও শুনে না থাকলেও 'ফয়লা' (অর্থ: 'মাছের আড়ৎদার'), 'শোণিমা' (অর্থ: 'নেল পালিশ') বা 'আহোল' (অর্থ: 'যে প্রতিটি জিনিষকে দুটি করে দেখে')-কে বাংলা শব্দ হিসেবে মেনে নিতে খুব কম বাঙালিই আপত্তি করবেন, কিন্তু 'ঙচেক' বা 'স্বকি'-কে বাংলা শব্দ হিসেবে মেনে নেবার আগে বেশির ভাগ বাঙালিই দুবার ভাববেন।

চতুর্থত, ৩নং নিয়ম অর্জন করাটা বিশেষ কিছু শব্দজোড় জানার উপর নির্ভর করে। 'সন্ত্রাস/সন্ত্রস্ত', 'বিন্যাস/বিন্যস্ত' ইত্যাদি শব্দজোড়ের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শিশুরা জানতেই পারবে না যে 'ত' প্রণবের অগ্রবর্তী অবস্থানে কখনও কখনও তালব্য 'শ' দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হয়। একইভাবে, স্মৃতিলোপ পেয়েছে বা পাচ্ছে এমন কোনো (অ্যাফাজিয়ার) রোগী যদি 'ত' এর উপস্থিতিতে তালব্য 'শ' প্রণব দন্তমূলীয় 'স'-দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এমন সবগুলো শব্দ ভুলে যায় তবে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মটিও তার ভাষাবোধ থেকে লুপ্ত হবার কথা। ১নং নিয়মের ক্ষেত্রে এটা হওয়া কঠিন, কারণ অক্ষরের উপধায় ঘোষতা লুপ্ত হয় এমন শত শত শব্দ আছে বাংলা শব্দকোষে। সুতরাং ১নং ও ৩নং নিয়মকে কোনোমতেই একই মানদণ্ডে বিচার করা যায় না বা একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পঞ্চমত, ৩নং নিয়মের সাথে রূপতাত্ত্বিক নিয়মের বেশ মিল আছে, কারণ রূপতাত্ত্বিক নিয়মও একান্তভাবে প্রতিবেশ-নির্ভর। আমরা যদি {বন্ধু} প্রাতিপদিকের সাথে {ত্ব} প্রত্যয় যোগ করি তবে আমরা পাবো 'বন্ধুত্ব'। কিন্তু একই প্রত্যয় যদি আমরা 'শত্রু' প্রাতিপদিকের সাথে যোগ করি তবে আমরা যে *'শত্রুত্ব' শব্দটি পাবো সেটি গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও এই গ্রহণ-অযোগ্যতার কোনো যুক্তিসম্মত কারণ নেই। অন্যদিকে 'বন্ধু' এবং 'শত্রু'– এই উভয় প্রাতিপদিকের সাথেই {তা} প্রত্যয় যোগ করে গঠন করা যায় : 'বন্ধুতা' (কবীর সুমনের গান: 'চাইছি তোমার বন্ধুতা') ও 'শত্রুতা', কিন্তু আবার *'জন্তুতা' গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে 'সন্ত্রস্ত' শব্দটি 'সন্ত্রশ্ত' হিসেবে উচ্চারিত না হবার কোনো কারণ নেই, যেমন কারণ নেই 'হাশতো' শব্দটি *'হাসতো' হিসেবে উচ্চারিত না হওয়ার।

৩. উপসংহার

বর্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহের রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ আলোচনায় বাক্যতত্ত্বের অনুপস্থিতির দুটি কারণ আছে: ১) পাণিনির যুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সূচিত হওয়া চমস্কীর সঞ্জননী ব্যাকরণযুগের আগে পর্যন্ত ব্যাকরণ বলতে মূলত ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বকেই বোঝাতো; ২) আমি যতদূর জানি, অধ্যাপক সিংহ বাক্যতত্ত্ব বিষয়ে খুব একটা মনোযোগ দেননি বললেই চলে। এছাড়া সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে রাজেন্দ্র সিংহের নিজস্ব চিন্তাভাবনা রয়েছে, যেগুলো সমাজভাষাবিজ্ঞান ব্যাকরণের অংশ নয় বলে বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নির্দেশিত রচনা

Aronoff, M. (1976) *Word formation in generative grammar.* MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

ভট্টাচার্য্য, শিশির (২০১৩) অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ, নবযুগ, ঢাকা।
Ford, A., R. Singh and G. Martohardjono (1997) *Pace Panini, towards a word-based theory of morphology*. Peter Lang, New York.
Singh, R. (2001) On language and linguistics: an ardhasataka for Ulli Dressler, on his sixtieth birthday. In *Schaner-Wolles* et al. (eds.) *Naturally*. Rosenberg & Sellier, Torino, 475-478.
Singh, R. (1984) Well-formedness conditions and phonological theory, in W. Dressler et al. (eds.), *Phonologica*, Cambridge University Press, Cambridge.
Singh, R. (1990) Vers une théorie phonotactique générative, *Revue québécoise de linguistique* 19:131-163.
Singh, R. (Unpublished manuscript) *Mysore Lectures on Phonology and Morphology*.